অবকাশ

কেমন লাগছে 'অবকাশ'? জানান আপনাদের মতামত। থাকে যদি কিছু পরামর্শ, তাও জানান। সানন্দে গ্রহণ করব আমরা। কারণ আপনারা ভালোবাসলে তবেই আমাদের পথচলা সার্থক।

আরও কিছু জানতে বা জানাতে এবং লেখা পাঠাতে -

মোবাইল ৯৫৬৪০৬৫৫৫৫ অথবা ই-মেল lipiarambagh@gmail.com

যে ঠিকানায় লেখা পাঠাবেন - দেবাংশু চক্রবর্তী, আর্থিক লিপি, ওয়ার্ড নং ৪, কোর্ট পাড়া, পোঃ-আরামবাগ, জেলা - হুগলি, পিন-৭১২৬০১

কেউ কেউ বলে থাকেন, তিনি বাংলার 'দ্বিতীয় বুদ্ধদেব বসু'। কবি হিসেবে তিনি নয়ের দশকের উজ্জ্বলতম ব্যতিক্রম। তাঁর সম্পাদিত আদম পত্রিকা ও আদম প্রকাশনা বাংলা সাহিত্যে ইতিহাসের নবতর সংযোজন। তিনি কবি, শিক্ষক, সম্পাদক ও প্রকাশক। নিজস্ব মননভূমিতে তিনি যতটা কড়া, ব্যক্তি হিসেবে তিনি ততটাই অমায়িক, অমলিন। সম্মানিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিশেষ বিশেষ সম্মাননাসহ, অসংখ্য সম্মাননায়। 'আর্থিক লিপি'র পাতায় এবার রইল এই গৌতম মণ্ডলের দীর্ঘ সাক্ষাৎকার।

আজ পর্ব ১

এই জগৎ আসলে তো বন্ধুই ঃ গৌতম মণ্ডল

লিপি ঃ কবি-সাহিত্যিকদের সাধারণ প্রবণতা অনুযায়ী, তাঁরা প্রথমে স্বনামে লেখা শুরু করেন, পরে নিজস্ব নামেই ফিরে আসেন। অথবা উভয় নামেই লিখতে থাকেন। বাংলা সাহিত্যে আপনিই বোধহয়, শরৎচন্দ্রের পরে দ্বিতীয় ব্যক্তি, যিনি প্রথমে ছদ্মনামে, পরে স্বনামে লেখায় ফিরেছেন। অনিলাদেবী থেকে শরৎচন্দ্র এই নামরহস্য আমরা জানি। কিন্তু, অরিন্দম নিয়োগী থেকে গৌতম মণ্ডল... এরকম উল্টো পুরাণ কেন?

গৌতম মণ্ডল : ঠিকই। স্বাভাবিক প্রবণতা থেকে এটা একটু আলাদা। উল্টো। আমি মফস্বলের ছেলে। নিজের মতো করে লিখতাম। আর পড়তাম। প্রচুর কবিতার বই। তবে লিটল ম্যাগাজিন জগৎ সম্পর্কে তেমন কোনও ধারণাই ছিল না। ধীরে ধীরে এলাকার অগ্রজ কবিদের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। তাঁদের কাছ থেকে আমি লিটিল ম্যাগাজিন সম্পর্কে খোঁজখবর পাই। তাঁদের মাধ্যমেই বেশ কিছু অসাধারণ কবিতার বই পাই। যেমন দেবদাস আচার্য'র 'মানুষের মূর্তি', গৌতম বসুর 'অন্নপূর্ণা ও শুভকাল', গৌতম চৌধুরীর 'কলশ্বাসের জাহাজ', পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলালের 'দেবী', জয় গোস্বামীর 'আলেয়া হ্রদ', একরাম আলির 'ঘনকৃষ্ণ আলো' ইত্যাদি। এইসব বই পড়ে তো আমি স্তম্ভিত। এঁদের মধ্যে আমার শুধু পড়া ছিল জয় গোস্বামী। সত্যি কথা কি বাকিদের নামও জানতাম না। তো সেই সময়ে তাঁরা অনেকেই পরামর্শ দেন, বাংলা কবিতায় তো অনেক গৌতম রয়েছে। তা নামটা পালটানো যায় কিনা ভেবে দেখতে। আমারও লেখালেখির প্রথমদিকে নাম নিয়ে একটা খুঁতখুঁতে ব্যাপার ছিল না, তা নয়। গৌতম মন্ডল মনে হত একেবারেই কবিসুলভ নাম নয়। কিন্তু অন্য নাম নিলে কী নাম নেওয়া যায়? তখন মাথায় এল সব মিলিয়ে একটা নাম হয়, তা যেন একই সঙ্গে কিছুটা গুরুগম্ভীর এবং অন্যকম। সেই সময় আমার মধ্যে একটা রাগি যুবকও বাস করত, যে কিনা তাঁর শত্রুদের দেখিয়ে দিতে চায় কিছু। তখন অনেক শত্রু। কেন না পড়াশোনা, একাডেমি পড়াশোনা প্রায় ছেড়ে দিয়েছি। আমাকে নিয়ে যারা অনেক কিছু প্রত্যাশা করত কবিতা লেখার কারণে, তারা আর আমার পাশে নেই। এমনকি পরিবারের লোকেরাও সবাই হতাশ। তো সবাইকে তো একটা কিছু দেখাতে হবে। কিন্তু কী দেখাব? কবিতা। কাদের দেখাব? যারা আমার বন্ধু ছিল, কিন্তু আর শত্রু না হলেও বন্ধু নেই। তো সেই ভাবনা থেকেই মাথায় এল। অরিন্দম। অর্থাৎ অরিকে দমন করে যে। অরিন্দম তো এল, তার পাশে কী থাকবে? মাথায় এল, এমন একটা কিছু শব্দ প্রয়োগ করতে হবে, যা টাইটেল হিসেবে ব্যবহৃত হয় ঠিকই, কিন্তু কমন নয়। ভাবতে ভাবতে মাথায় এল নিয়োগী। এভাবে ব্যাপারটা দাঁড়াল অরিন্দম নিয়োগী। তখন পুরোটা মিলিয়ে, নিজের মনে মনে একটা মানেও ভাবতাম। অরিন্দম নিয়োগী অর্থাৎ অরিকে দমন করার জন্য যাকে নিয়োগ করা হয়েছে। এই রকম। তবে পরবর্তীকালে পুরো ব্যাপারটাকেই ছেলেমানুষি মনে হয়। কে কাকে দমন করবে? আর তাছাড়া মানেটা মনে হয় ঠিক নয়, নিয়োগী মানে নিয়োগকর্তা। যাই হোক, পরে এব্যাপারটা অর্থাৎ ছদ্মনামের ব্যাপারটা আমার কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। মনে হয় মেকি। কবিতা লিখতে এসে একজন কবির প্রাথমিক কাজ সত্যের সামনে দাঁড়ানো। আমি সত্যের সামনে দাঁড়াতে চাই। ফিরে যাই স্বনামে। এই হল মোটামুটি গল্প। অরিন্দম নিয়োগী থেকে গৌতম মণ্ডলে ফিরে আসার গল্প।

লিপি: কবিতায় এলেন কেন? এই আসাটা কি পূর্ব পরিকল্পিত? নাকি হঠাৎ করে?

গৌতম মণ্ডল : কবিতা দু-একটা স্কুল ম্যাগাজিনে লিখতাম ঠিকই কিন্তু কবিতায় আসাটা একেবারেই পূর্বপরিকল্পিত নয়। শুধু তথ্যের জন্য জানাই, আমি রামকৃষ্ণ মিশনের ফার্স্ট বয় ছিলাম। এইরকম মিশনের ফার্স্ট বয়দের যেমন আকাঙ্ক্ষা থাকে আমারও তাই ছিল। কিন্তু গোলমাল বাঁধল ক্লাস নাইন থেকে টেনে ওঠার সময়। সেই সময় আমি ভয়াবহ ডিপ্রেশনে আক্রান্ত হই। কিন্তু এই ডিপ্রেশনের কথা কাউকে জানাইনি। চিকিৎসকের কাছে না গিয়ে নিজেই ডিপ্রেশন থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে থাকি। এর ফলে মাধ্যমিকে যথারীতি যেরকম রেজাল্ট হওয়ার কথা তা হয় না। ডিপ্রেশন আরও বেড়ে যায়। আমি ক্রমশ একাডেমিক পড়াশোনার জগৎ থেকে দ্রুত বিচ্যুত হতে থাকি। সেই সময়ই আমি মুক্তির ঠিকানা হিসেবে আঁকড়ে ধরি কবিতাকে। কবিতাই আমার আরোগ্য হয়ে দাঁড়ায়।

লিপি : কিন্তু, প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী, যাঁরা কিছুই পারে না, তাঁরাই কবিতা লেখে। দান্তে তো বলেইছেন, কবিদের নরকে যেতে হবে। ফার্স্ট বয়, হঠাৎ এপথে? অন্য মাধ্যমও তো ছিল? কবিতায় কেন?

গৌতম মণ্ডল : সেটা তো বললাম। ডিপ্রেশন কাটানোর জন্য চিকিৎসকের কাছে না গিয়ে নানান কিছুর ভিতর মুক্তির উপায় খুঁজতে থাকি। আর এসব করতে গিয়ে একাডেমিক পড়াশোনা থেকে বিচ্যুত হতে থাকি। সেইসময়, মনে হতে থাকে, এসব প্রথাগত ডিগ্রির কোনও মূল্য নেই। এসবের ভিতরে থাকতে থাকতেই কবিতা লিখতে থাকি, কবিতা পড়ি। আমি দেখি, যখন কবিতার ভিতর থাকছি, তখন অনেকটা ভালো থাকছি। এভাবেই ক্রমশ কবিতায় জড়িয়ে পড়ি। আক্রান্ত হই। অন্য মাধ্যমের ভিতর আমি সেই আরোগ্য লাভের ঠিকানা পাইনি।

লিপি : আপনার প্রথম কবিতা গ্রন্থ 'ঊ জাগর আঁখি'। এই নামকরণ নয়ের দশকের বাংলা কবিতায় এক বিশেষ ব্যতিক্রম। এর ভেতরে যে আর্তি, সেটা কি আপনার ওই 'আরোগ্য লাভ' এর?

গৌতম মণ্ডল : তা খানিকটা হতে পারে। তবে এ বইটির কবিতাগুলিকে আমি একেবারেই গুরুত্ব দিই না। বস্তুত বইটা প্রকাশিত হওয়ার পরই মনে হতে থাকে, এটা না বের করলেই ভালো হত। বইটি আমি সেভাবে কাউকে দিইওনি। আমার খুব কাছের বন্ধু বান্ধব ছাড়া এই বইটি সম্ভবত কেউ দেখেনি।

লিপি : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একবার বলেছিলেন, যেকোনও বাঙালি কবি কবিতা রচনা শুরু করেন, প্রথম প্রেমে পড়ার পর। মানে ধরে নেবো, প্রেম নয়, বাংলা কবিতায় আসার পিছনে আপনার ভেতরে কাজ করেছিলো, বিশেষ বোধ? এটা কী আত্মবীক্ষণের? নাকি আত্মসমীক্ষণের?

গৌতম মণ্ডল : আত্মবীক্ষণ বা আত্মসমীক্ষণ— কবিতায় আসার সময় এসব কিছুই ভাবিনি। লিখতে গিয়ে ভালো লাগত তাই লিখতাম। এই যে ভাল লাগা, অনন্ত বিষাদের ভিতর এক ঝলক রোদ— এই শুধু কবিতারই ভিতর পেতাম। কিন্তু লিখতে লিখতে যখন মনে হল, এটাই আমার কাজ, আমার বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন তখন আমার ভিতর আরও বোধ কাজ করতে লাগল। আত্মবীক্ষণ এবং আত্মসমীক্ষণ— এ দুটোই এসেছে পরে।

লিপি : এটাকেই কী আপনি বলবেন নির্মাণ? কবির গড়ে ওঠা, কবিতায় হয়ে ওঠা?

গৌতম মণ্ডল : নির্মাণ বলব না, কবির গড়ে ওঠা। কবিতার হয়ে ওঠা। বা ওঠার দিকে একটা যাত্রা।

লিপি : কবিতায় সচেতন নির্মাণ বলে কি কিছু হয়? মানে, কবি গৌতম মণ্ডল কী সচেতন কাব্য নির্মাণে বিশ্বাসী?

গৌতম মণ্ডল: কবিতা পুরোটা সচেতনভাবে হয় বলে আমি বিশ্বাস করি না। আবার কবিতাকে কবির স্বতস্ফূর্ত উচ্চারণ বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁদের সঙ্গেও আমি সম্পূর্ণভাবে সহমত নই। আমি যখন কবিতা লিখতে শুরু করি তখন আমি জানি না কবিতাটা কোথায় শেষ হবে এমনকি অনেক ক্ষেত্রে পরের লাইনটা কী হবে তাও আগে থেকে বলতে পারি না। কিন্তু লেখার পর কবিতাটিকে নিয়ে নানা রকম পরিমার্জনার ভিতর দিয়ে যেতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে কিছু শব্দ এমনকি পংক্তি বাদ যায়, অনেক সময় অনেক কিছু সংযোজিতও হয়। এই যে পরিমার্জনার সময় যে মনটা কাজ করে তা তুলনামূলক অনেক সচেতন।

লিপি : কবিতায় পরিমার্জনা কি খুব জরুরি। বাংলায় অনেক বিখ্যাত কবি আছেন, যাঁরা পরিমার্জনায় বিশ্বাস করতেন না। যেমন শক্তি চাট্টোজ্যে।

গৌতম মণ্ডল : আমি মনে করি, পরিমার্জনা জরুরি, কোনও কোনও সময়। যদিও তার পরিমাণ খুবই কম, যা লিখি তাকে আর তেমন কিছু করতে হয় না। কিন্তু অনেক সময় তা করতেও হয়। এই পরিমার্জনা অনেক ক্ষেত্রে অনেকদিন ধরে চলে। আমি কোনও কোনও ক্ষেত্রে পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা তো বটেই, অনেক ক্ষেত্রে বইয়ে প্রকাশিত কবিতাও পরিমার্জনা করি। কাজেই এ ব্যাপারে আমি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কোনওভাবেই সহমত নই। আমার তো মনে হয়, শক্তি যদি নিজের কবিতার প্রতি আরও একটু মনোযোগ দিতেন, বিশেষ করে মাঝবয়সের পরের লেখা, তাহলে তাঁর কবিতা আরও উচ্চস্তরে পৌঁছতে পারত।

লিপি : বারবার নৈঃশব্দ, বালিয়াড়ি, টিলা ইত্যাদি, পাশাপাশি একটি আটপৌরে গ্রামীণ জীবনের কথা আপনার কবিতায় উঠে আসে। কেন? এমনকী আপনার একটি বইয়ের নাম সম্ভবত 'অলস রঙের টিলা'। এর ভেতরকার রহস্য কী? মন্থন?

গৌতম মণ্ডল : বাংলা কবিতাকে আরও বেশি স্মার্ট করতে গিয়ে আমরা আমাদের ঐতিহ্যকে অনেকেই ভুলে যেতে চাইছি। কিন্তু কোনও ভাষার কবিতাই ঐতিহ্যকে বাদ দিয়ে দাঁড়াতে পারে না। ঐতিহার কথা এলেই আসবে মাটির কথা। মাটি। এই মাটি হল আবহমান গ্রামবাংলার মাটি আর জলহাওয়া, লোকজীবন। কবিতায় যেমন দরকার নাগরিকতা, ঠিক তেমনি দরকার ঐতিহ্য, গ্রামবাংলা। আসলে কবিতা, একটি সার্থক কবিতা, অনেক কিছুই দাবি করে। অনেক ধরনের এলিমেন্ট, সারবত্তা। এখানে চেতন মনের পাশাপাশি দরকার অবচেতন মনও, বাস্তবের পাশাপাশি রহস্য। ইমাজিনেসন। একটি বড় কবিতা, মহৎ কবিতা ইমাজিনেসন ছাড়া হতে পারে না। যে বইটির কথা বলতে চাইছ, অলস রঙের টিলা, তার নাম থেকেই বোঝা যায়, প্রযুক্তি পৃথিবীর কবিতা নয়, নাগরিক কবিতা নয়, আবার তা নাগরিকও। কেমন নাগরিক? মন্থন, আবহমান গ্রামবাংলা। অবচেতনের। যৌনতারও। এসবেরই যৌথ মন্থন। আর মন্থন মানেই তা নীরব। এই কারণে নৈঃশব্দে বারবার আসে। কখনও সরাসরি কখনও তা সংকেতের মাধ্যমে।

লিপি: একদম ঠিক। আজকের দিনে বাংলা কবিতায় চলছে পুনর্নির্মাণের খেলা। আপনার কি মনে হয়, গ্রামীণজীবন বা গ্রামীণ অনুষঙ্গকে বাংলা কবিতায় ফিরিয়ে আনাটা জরুরি? আপনার কবিতাতেও গ্রামীণ ও কল্পগ্রামীণ অনুষঙ্গ ভীষনভাবে ছায়া ফেলেছে। এসম্পর্কে আপনি 'ভূ পাখি ভস্মপাখি'তে অনেক কথাও বলেছেন।

গৌতম মণ্ডল : আমাদের সভ্যতার একটা প্রধান স্তম্ভ গ্রাম। গ্রাম আমাদের শিকড়। তাই গ্রামকে বাদ দিয়ে কোনওভাবেই কোনও শিল্প সম্পূর্ণ হতে পারে না। কবিতাও যেহেতু একটি শিল্প, সবচাইতে সূক্ষ্ম শিল্প, সেহেতু কবিতাও গ্রামকে ছেড়ে খুব বেশি দূর এগোতে পারবে বলে মনে হয় না। পাশাপাশি এটাও ঠিক, শুধুমাত্র গ্রামজীবনের ভিতর যদি কবিতা আটকে থাকে তাহলেও তা কিন্তু এক ধরনের ব্যর্থতা। কবিতাকে ধারণ করতে হবে সমস্ত কিছু। নগর ও গ্রাম। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। এক কথায় মহাবিশ্ব। তার আলো ও আঁধার, চৈতন্য। কিন্তু এগুলো, লক্ষ্য রাখতে হবে, কোনওভাবেই যেন প্রকট না হয়ে ওঠে। অনেক কিছু ধারণ করেও কবিতা হবে স্বনির্ভর। আমি কবিতাকে এভাবেই দেখতে পছন্দ করি। 'ভূ পাখি ভস্মপাখি'র কবিতাগুলো খুবই বিমূর্ত। এখানে একটা পরাবস্তব জগৎ রয়েছে। আর রয়েছে যৌনতা। কবিতাগুলির পরতে পরতে রয়েছে যৌনতার অনুষঙ্গ আর অচেতন। রয়েছে ইমাজিনেশন।

ক্রমশ

ক. বি. তা.

নত পলক

অনিন্দিতা সেন

অনেকেই বলে ভালবাসি
ফাঁকা আওয়াজে ব্যস্ত কেউ কেউ,
সামিল হয় মিথ্যাচারে
গভীরে না গিয়েও...!
শিউলি ভেজা এমনই এক ভোরে
উদাসী বাতাস আসে দ্বারে,
শূন্যতার মাঝে স্বপ্ন দেখা
চৌকাঠের এধারে ওধারে,
জুঁই ফুলের গন্ধ মাখে
অনুভূতির সপ্তসুর,
বুকের খোলা প্রান্তরে
বাসাহীন ভালোটুকু থাকে,
উপোষী গোধূলি আঁকা
চোরাগোপ্তা গোপন গলিপথে
বেদনা যখন ঘরবাড়ি হয়
নিরাপদ দূরত্ব রাখে!
এমনই এক বর্ষা দিনে
বিভ্রান্ত সেই নত পলক
কথা দিয়ে কথা রাখার মোহে
দেহজ ভালবাসায় মাতে!

পুরাণ কথা

তপন সৎপথী

অনেক এসেছে বক, পাখনায় ঢেকেছে পুকুর
তারপর অভিমানে উড়ে গেছে দূরে বহুদূর,
এখনো পালক পড়ে দক্ষিণের তেলকুপি ঘাটে,
কুকুরের সহবাসে আগুন জ্বলছে আজও মাঠে।
ফিরে রোজ সাঁঝ পাখি অবেলায় নীল আসমানে
আমি একা চুপচাপ বামুন পাড়ার ডান কোণে,
ওদের দেখেই আমি উঠি রোজ সন্ধ্যার আগে
চলে যায় হাঁসগুলি পরকীয়া প্রেমের আবেগে।
তারপর সন্ধ্যায় কিঁকিঁপোকা আনাচে কানাচে
জোনাকির মৃদুআলো জানালায়, কিছু বিছানাতে,
সারারাত শিয়ালের উল্লাস বাঁশের বাগানে
কালোরাত নিঃশেষ ভোরের আলোর আগমনে,
বিছানা একই থাকে, একমনে আমার সংসার
ঝোপঝাড়ে আছি আমি ধ্বংসস্তূপে রাজা বিম্বিসার।

টান

বন্যা লোহার

পাথুরে মাটি, লালচে ধুলো
খয়েরী রঙের বিষন্নতা।
পাথর ভেঙে গল্প হলো,
গাঁয়ের নাম টেরাকোটা।

রুক্ষ-সুক্ষ জীবন যাপন
বুকের তারে গভীর টান,
সহজ সরল মানুষ কখন
কাদা মাটির সংস্থান।

দারুণ প্রখর গ্রীষ্ম যেমন,
হাড় কাঁপানো শীতও হাসায়।
সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বলল যখন,
প্রাণ জাগল গ্রাম্য ভাষায়।

রোদে পোড়া ইটের শহর,
সবুজ কোনও গভীর বন ;
নকশা খাঁচা ওনাছে প্রহর,
যুগান্তরের উচটান;